প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৪,

প্রকাশক
দীপেন রায়
সীমান্ত
৬সি, স্কট লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
বাদল ভট্টাচার্য

নজরুল
সুকান্ত
স্মরণে

সূচীপত্র

ফোটাতে গোলাপ

(শ্রীযুত দীপেন রায় বন্ধুবরেষু)

কমরেড, এক একটি মুহূর্ত ছুরির ফলার মতো
কুচি কুচি করে আমার অস্তিত্ব
পারি না কিছুতেই ধ'রে রাখতে দৃঢ়হাতে সময়ের বল্গাকে
সপ্তরশ্মির মতো,
যেন অনিন্দ্য গোলাপের কাঁটাগুলো বেঁধে হৃৎপিণ্ড
ইচ্ছের তীরের মতো
অথচ পারি না কেন ফোটাতে গোলাপ
সবই নাকি সময়ের স্বায়ত্বশাসন।

অথচ মুহূর্তগুলো
আশৈশব হেঁটেছিলো ভালোবেসে মাটি
চোখে জ্বলেছিলো আলো দিগন্ত বিস্তৃত
বজ্র-মুষ্ঠি হয়েছিলো প্রসারিত অবাধ আকাশে।
মাটিতে পা ঠুকে শব্দের মিছিলে অগম সমুদ্রের
ঢেউ উঠেছিলো
ফোটাতে গোলাপ নৈসর্গিক বেদনায়।

কমরেড, আমার ইচ্ছের যন্ত্রণা
সমুদ্রের তাপে ধ'রে রাখা
সময়ক্ষণকে,
পর্বতের স্থিতধী কিংবা পাখির নীড়ের 'তা'
দিয়ে ফোটাতে সমাজ।
কোটি কোটি মানুষের হা-ভাতে স্বদেশ
শুধু তারই জন্যে আশৈশব পথ খুঁজি মাটির উত্তাপে,
কি নিদারুণ মমতা।
ভালোবাসা ফুল ফোটা
অথচ যন্ত্রণা কি যে ফোটাতে গোলাপ।

এই পথে

(অগ্রজকবি শ্রীযুত তরুণ সান্যাল শ্রদ্ধাস্পদেষু)

কে আমায় মেঘের ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়
সূর্যের বুকের কাছে,
অথচ সূর্যের তাপ
আদৌ আমার লাগে না,

শুধু
একটি রূপালী রেখা দিগন্ত বিস্তৃত
হাত দুটি ধরে,
কে আমায়, কোথায় ভাষায় !
বকের মতন শাদা ডানাগুলি
একটু পরেই,
আলকাতরার মতো অন্ধকারে
সমস্ত দরজা হাট ক'রে
হাস্নুহানার গন্ধ ছড়ায়,
সপ্তপদী রামধনু
আলোর বল্লম দু-চোখে বিঁধে
আমাকে জাগায়

একটু আগে এই পথে
প্রচণ্ড আগুন ব'য়ে গেছে,
এই পথে ভয়ংকর শ্বাপদের দল
বুকে হেঁটে পার হয়—
তবু মানুষের স্রোত
এই পথে, সুদূর বিস্তৃত মেঘের ভেলায় ।

রবীন্দ্রনাথকে কিছু বলা

প্রতিমুহূর্ত.........কে—
আমাকে কুরছে, ঘুণ ধরে গেছে
আমার কাঠের দেহে, উই পোকারা বেঁধেছে বাসা
আমি মাটি হ'য়ে যাবো বৃক্ষের শরীরে।

কেউ তো হৃদয় ছুঁয়ে
আমার রক্তের তোড় জাগাতে পারে নি
কৃষ্ণচূড়া-হৃৎপিন্ড বুকের গহ্বরে লাশ হ'য়ে যায়—
আমার দু-চোখে জ্বলে—ঘুঁটে কুড়োনি মায়ের মুখের আদল
বন্যার দাপটে থৈ থৈ ভরাডুবি গ্রাম
অথচ বৃষ্টির চিহ্ন নেই কণামাত্র
কোথায় ফেরাবো মুখ ঃ বলো তো রবীন্দ্রনাথ!

আমি সমর্পিত, নিঃস্ব এবং নিবেদিত
তোমার সত্তায়—আমার যাবতীয় জাগতিক
সুখ দুঃখ অভাব তোমার গণগণে আঁচে
প্রবাল কিংবা পলাশ হ'য়ে যায় সমুদ্র গভীরে

আমি বেঁচে উঠি, জেগে উঠি না-মরে, না-ঘুমিয়ে
তুমি আছো চারিদিকে যেন নৈসর্গিক অনিন্দ্য গোলাপ।

কেউ কি তা জানে

তীরের মতো আকাশ বিঁধে ছেয়ে গেছে
—সে কি শকুনির ঝাঁক
না কি বোমারু বিমান ?
ভাসতে ভাসতে ভেসেই চলেছে তালকানা
শান্ত হিমালয় বুকে
বুঝি বরফের ঢেউ
সারা এভারেস্ট জুড়ে ফুলের বাগান নীচে
কালো কালো দাগে ভরা—সাজানো সংসার কত।
শিশুরা পাথর যেন
এক একজন হিমালয়।
মধুলোভী মৌমাছিরা কখন ফুড়ুৎ
কি জানি কি হ'য়ে গেল
কার ভাগে গেল মধু
অদৃষ্টে কার সে হাসি কাত্তানের মতো ঝোপ
কার গর্দানে কখন যে আসে—কেউ কি তা জানে।

অভীক মুহূর্তে

অভীক মুহূর্তে কোনো, কেউ যদি পায় হলুদ মন
জ্যোৎস্নার শরীরে ইচ্ছেগুলো লীন হয়, যেন দিনরাত
ঘুরে ঘুরে পেঁছে যাওয়া সূর্যের তরঙ্গে, মনে হয়
ডানা মেলে পরীরা ; না, পেঁজা পেঁজা মেঘ অকস্মাৎ !

অকারণ ডাকে দুর্মর, দুর্ণিবার—বুঝি মেঘের আড়াল
থেকে বৃষ্টি, নয়তো মাটির ভেতর থেকে সুপ্তবীজ
কিংবা বুকের ভেতরে উগরে ওঠা পারদ উত্তাপ
স্মৃতি বিষণ্ণতা কিংবা প্রেম পরিপ্লুত সে এক বোধ ।

কোনো নিবিড় মুহূর্তে হই যদি শিশু কিংবা মেঘ
বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দু'পা দ'লে মান্ধাতার মূলে টান
বাঁ হাত বুকেতে রেখে ডান হাত তুলে দেওয়া শূন্যে
তা-তা থৈ থৈ দিনে অন্ধকার ছুঁলে আলো চেনা ।

এমন সুন্দর সকাল

এমন সুন্দর সকাল যদি রোজই আসে
আমি ভালো থাকি
কুয়াশায় ভীড় ক'রে আসে
যে সমস্ত অবিশ্বাস
ধবধবে সাদা হ'য়ে যায় রৌদ্রে ডোবালে,
বুঝি কারো ছোঁয়া
ছোঁয়া পেলে সব সাদা, স্বচ্ছ পরিষ্কার
মেঘহীন আকাশে যেমন
নক্ষত্রেরা খেলা করে শিশুর খুশীতে
নীচে ব'সে একা আমি
সবুজের গালিচায় রাতকে দুফোঁড় ক'রে
কি যেন খুঁজি, কীই বা !
আমার তেষ্টা মরুভূমি :
অনির্বাণ, অনিকেত
অথচ আকাশ ভরা তারা গ্রহ
নক্ষত্র আশ্চর্য নয় ;
আশ্চর্য কখনো নয় এইসব সহোদর
যাঁরা পথ হাঁটে সারারাত ।

আঁজলে পিঁজলে

আমাকে পোড়াও, পোড়াও আগুনে আঁজলে পিঁজলে
আমার শরীরি কাম ক্রোধ লোভ পুড়ুক পুড়ুক
দহণদাহণে— ,ধরো হে আলোয় আমার, যে আলো
অমানিশা রাতে অন্ধকারে জ্বলে আকাশ কিনারে,
কে সে বর্ণজয়ী আলো ঃ   নক্ষত্রমণ্ডলী ম্লান যেথা,
জ্ব'লে জ্ব'লে পুড়ে পুড়ে খুঁজে পেতে চাই—চাই তারে।

আমার বোধ ও সত্তার আগুনে কিসের অভাব
ধ'রেও ধরে না প্রাণের সলতে—র'সে গেছে ডগা,
হাওয়া যদি মেলে গণগণে আঁচ মণির মতন
খুঁজে পেতে চাই ঃ   আঁজলে পিঁজলে দীপালী রজনী
লাফালাফি করে নিয়নের রেসে—মানুষের মতো
নক্ষত্রমণ্ডলী নীরব দর্শক শক্তির গৌরবে।

মাটিতে পা রেখে সূর্যের হাত ধ'রে

(অগ্রজকবি শ্রীযুক্ত রাম বসু শ্রদ্ধাস্পদেষু)

পাতাগুলো খসে পড়ে এক একটা দিনের মতন টুপ্‌-টাপ্‌
রোদেরা এলিয়ে দেয় সারা গা অপরাজিতায়
অভিমানী যে অরণ্য এতদিন অভয়দাতার
ছদ্মবেশে নিমগ্ন তটস্থ সেও

হাপরের নিঃশ্বাস নিয়ে হরবোলা দিনে উদাসীন
দিনদুপুরে মাথা খেয়ে, পোড়াবাতাস হু হু করে, দিন ভোর
যে আকাশ ভুরু দিয়ে বেঁধে রাখে চোখের জলের
বাঁধ, পৃথিবী ঘুরছে তবু—
টিক্‌ টিক্‌ ঘড়ি চলে বাজাতে বাজাতে দিনরাত্রি
চায়ের টেবিলে কথার কুন্ডলী সমাজ সাহিত্য নিয়ে,
চিত্রকল্প আঁকা মানুষের, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা
দেব-দ্বিজে মান্ধাতার, যেমন রেকর্ড
ঘুরছে, পৃথিবী এবং দুনিয়ার হালচাল, যেন
ছবি শস্যের দানারা সর্বত্র ছড়ানো ধর্মে, মতে
নীতিতে, কোথায় কেমন ফসল ফলে বোধের কর্ষণে—
মাটি যদি মেলে, কজনই তা চেনে ?

মাটিতে পা রেখে, সূর্যের হাত ধ'রে যেমন পৃথিবী
ঘোরে—আমি উদাসীন নীরোর মতন বাজাব বেহালা
বিংশ শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন্ত সে হৃদয়ে
সাড়া দেয় লিঙ্কন, লেনিন, রবীন্দ্র, নেরুদা এবং নজরুল।

নিঃশব্দ হাওয়া

নীরব নিঃশব্দে কখন এসেছে হাওয়া মনের ভেতরে
ঠিক যেন হেমন্তের হিম মিশে গেছে সারাটা উঠোন
একি পুণ্য, নাকি পাপ পদ্ম হোয়ে ফোটে বোধিবৃক্ষে
বোঝাতে পারি না ঃ কী যে ভালো লাগে মৌসুমি হাওয়া
দিগন্তের নীচে সবুজের চটে করতালি ওঠে।

কিছু নয়, নয় শুধু কথা, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা
স্বাধীনতা আপন অস্তিত্বে অগ্নির বিস্ময়
নাকি সমুদ্রের নিতল গহ্বরে আগুন জ্বলছে
যে আগুন জ্বলেছিলো একদা দ্বাপরে
কী সংশয়, হতভম্ব পার্থ তোলেনি গাণ্ডীব টংকার

আমার চেতনায় পাড়াগাঁর স্বপ্ন সে ভারতবর্ষ
ভোরের পুজোর ঘরে কখন এসেছে নিঃশব্দ হাওয়া।

স্বপ্নময় হে স্বদেশ

কি বিশাল মহিমা তোমার
স্বপ্নময় হে স্বদেশ সমুন্নত হিমালয় তোমার ললাটে
সিঁদুর—; মহত্তম শিল্পী যেন
মানুষের বেদনায়। কি সৌন্দর্য সে যে আঁকা হয়
রোজ রোজ নিপুণ তুলিতে—কার, কেউ বোঝে।
ফুলগুলি খুন হ'লে কিসের সঙ্কেত রক্তের অক্ষরে
নিজেকে হনন কোন দেশপ্রেম—
বুকের গভীরে যদি চোখ মেলে দাও আসমুদ্র হিমাচল
অথচ যে কথা ছিলো—
ছিলো কথা দাঁড়াবার, শিরে যার সু-উন্নত হিমালয়
যদি দাঁড়াতে স্বদেশ—
ঝড়-জল বৃষ্টি-শিলা বুকের পাঁজরে স্তরে স্তরে যে হৃদয়
পরিশ্রুত যন্ত্রণায়
এতদিনে ভোগবতী হতো শুধু মানুষের, মানুষের তরে।
গভীর গভীরতম জীবন প্রেরণা সমাগত—
পাহাড় সমুদ্রেও ফোটে ক্ষরণের ধ্বংসাবশেষ
হাজার বছর ধ'রে অক্টোপাশে বন্দী কত দেশ
অন্ধকার বিভীষিকা থেকে উত্তরণ যে আলোকে
সেই আলো আলোর বল্লম বিঁধে বিঁধে
অমাবস্যা খুন ক'রে আনো মহালয়া বড়ো প্রার্থনায়।

বিবেক

(শ্রীযুত সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রজপ্রতিমেষু)

দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে, যে ধ্যানস্থ চেতনা
শাণিত হৃদয় চিরে
সবিনীত প্রার্থণার সার্বিক এষণা
বিবেকের নত শিরে।

কোথা কোন গাছে ফুল নতুন বৃক্ষের
আনত সে ফলভারে
শাখা প্রশাখায় প্রস্ফুটিত নক্ষত্রের
প্রাণদান অঙ্গীকারে।
কেন সে হৃদয় মেলে, যার ছায়া পড়ে
দুয়ারে দাঁড়ায়ে সে কে,
সেখানে কি স্বস্তি বক্ষের চত্বরে—
আসে না সে-কথা মুখে।

না, চাহিনা বিকোতে নিজেকে
নম্য খৃষ্ট নামে, মুগ্ধ গোলাপী ডলারে
পৃথিবীর কোটি শিশু ক্রুশীবদ্ধ সৌজন্য শিকারে
দুয়ারে দাঁড়িয়ে কে, সে আমার বিবেক।

কোলকাতার সকাল

প্রত্যহ আলোর অন্ধকারে জলজ্যান্ত কোলকাতা
নতজানু ঈশ্বর সমীপে। কারণ প্রত্যহ রাত্রির গভীরে
পেঁচা ডেকে ওঠে—বাদুড়েরা ডানা ঝাপটায়,
গুমো গুমো জ্বর ওঠে যক্ষ্মারোগীর মতন দেহের পারদে।

যে উত্তাপে তাপ বাড়ে—দেহলীর প্রতি লোমকূপে
দেহের সীমানা ছেড়ে কাজ করে গোবরে পোকার মতো
সারারাত ধ'রে—রাতকাজ করে কাজের পোকারা
হন্তদন্ত হ'য়ে ফেরে—যদিও ফেরার ঘণ্টা বেজে গেছে।

অথচ তারুণ্যে পিচ্ছিল দুর্দান্ত বিশ্বামিত্র ইতস্ততঃ
টোপ ফেলে, দৃষ্টি হানে—এবং জর্জরিতা মেনকার দল
স্বাদিষ্ট ভোগের জন্য মন্ত্রপূত—স্বেচ্ছায় স্বৈরিণী
প্রকৃতি প্রত্যয়ে নাকি আকাশের জানালা দরোজা খুলে যায়!

এবং প্রতিরাতে রাজপথে কল্লোলিনী কোলকাতা
আলো ও আঁধারে ঈশ্বরের পদচিহ্ন বুকে সেঁটে
অনির্বাণ সূর্যের মতন জন্ম দেয় প্রত্যহ সকাল—

অথচ সকাল এলে মাঝুমেরা চেতনায় সাড়া মেলে।

বুকের অরণ্যে

এমন অনেক ইচ্ছে দেখা হয় রোজ
দেবদারু ছায়ার নীচে, কাঁপা কাঁপা
রোদে জ্বলে ঝিকিমিকি পাতার ঝালর
মনে হয়—এখুনি ঝরবে পাতা।
অথচ বাতাসে নেই শব্দ, ধ্বনি
ঝরার কেন যে নিঃশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস
সে কি হায়েনার নিষ্ফল গর্জন
বুকের অরণ্যে।

কখন যে ঝরবে পাতা, চিহ্নরেখা স্পষ্ট
বৃক্ষজুড়ে, যদি হাওয়া বয়—
শিশু-বুড়ো-ছেলে-মেয়ে ঢেউয়ের মতো
উপচে পড়ে উত্তালে ঃ ছায়াতলে ইতিউতি রোদ
চিকণ সোনার মতো উঁকি মারে—
দীর্ঘছায়া মেলে দেয় মন।

সমর্পিত প্রার্থনায়

নিজের মুখের প্রতিবিম্ব যদি জলের দর্পণে
প্রত্যয়ে ফলিত হয়, তবে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষায় শব্দহীন
একা থাকা নিষ্পলক মাছের মতন
অতলান্ত সবুজ গভীরে।

এবং গভীরে, একান্ত গোপন, গভীরে…
যতই ডুবেছি সন্তরণে
মাছের চোখের মতো অনুক্ষণ
চিনেছি নিজেকে
আমার আসল শত্রু
যে, সে আমি নিজে।

প্রাগৈতিহাসিক বটবৃক্ষসম
কৌলিণ্য ছোঁয়াচে আত্মদানে পরিতৃপ্ত
শান্তি নামে—
অথাপি শোষণ
করেছি নিজেকে,
আগাছার মতো নিজেই গিলেছি
আত্মজকে
সমর্পিত প্রার্থনায়।

দুধের শিশুর মুখ

যে স্বপ্নেরা কার্তিকের শিশিরের ধানের গোছের মুখে
মুক্ত হ'য়ে ফলে
মাটির দেহের সৌরভ ছড়িয়ে কি যে স্বাদ ব্যাকুল বাতাসে
যেন দুধের শিশুর মুখ।
যে মুখের জন্য মাঠের দিগন্ত ছাড়িয়ে রামধনু ধ'রে আনে
সাহারা গোবির দেহে,
যে দেহের কলিজায় জ্বলে অমরতা ভালোবাসা মাটি
আসমান ছেড়ে।
আমার মাটিতে হাত দেবে কে ?   যে মাটিতে মায়ের স্বপ্ন
ধানের গোছের মুখে ঃ
নিষ্পলক চোখের তারার মতো শিষে শিষে উন্মুখ
হৃদয়-হলুদ মেখে।
রূপালী চাঁদের হাসি আকাশ ছাড়িয়ে দোল খায়—
মাটির কিনারায়
যেথা ধানের হৃদয় নতুন বীজের ভারে
আনত—শরীর জ্যোৎস্না।
যে আকাশে কু-চক্রীর চক্র রাতের গভীরে কিংবা দিবালোকে
মেঘের মতো ছেয়ে রাখে
আলোর তল্লাট, নতুন বীজের নবাঙ্কুর
মেলেছে হেথায় প্রসারিত বাহু।
সে মাটিতে হাত দেবে কে ?   যে মাটির ছোঁয়ায়
প্রপিতামহের রক্তের কল্লোল
এই জনপথে গর্জে ওঠে
স্বাধীন শিশুর মতো।

এই হাসপাতালে

(প্রয়াত সত্য মণ্ডলের রোগশয্যায়)

এই একটু আগেই
স্নায়ুতন্ত্রে ঘণ্টা বেজে গেলো
মুহূর্তকে ধরে রাখা
মহাকালের বুকের কাছ থেকে
আপ্রাণ প্রয়াস
কিছু নিমেষকে চুরি ক'রে
চোখে চোখ রাখা, কথা অনর্গল—
যদিও ঘণ্টা বেজে চলে ক্রিং ক্রিং
হাসপাতাল চত্বরে।

জানি তো সবাই চ'লে যাবো—
এই পথ, এই সবুজ লন—
আলো ঝলমল শহর ও বন্দর ছেড়ে
অন্য পারে,—তবু তুমি হাসো, কত কথা বলো
চমৎকার, যেন মৌসুমী বিকেল
এই হাসপাতালে।

যদি আর দেখা নাই-ই হয়—
আগামী বিকেলে—এই ভেবে,
ভেবে ঘণ্টা বেজে চলে স্নায়ুতন্ত্রে : বিচ্ছেদের।

সমবায়

(শ্রীযুত গোবিন্দ ভট্টাচার্য অগ্রজপ্রতিমেষু)

সবার বলার আছে আমার নেই
সবার অভাব আছে আমার নেই
লোকে তাই তো বলে—
সবাই দুঃখে কাঁদে, আমার কি—
কান্না নেই, লাজ লাগে, মরণ আর
কাকে বলে, বুকে বড়ো দাগা
বুঝবে কে সে !

সবার অসুখ আছে আমার সুখ
সবার হিংসে তাতে আমার কি !
হাসিতে ভরে রাখি আমার মুখ
এই তো জীবন বন্ধু !

সবার সুখে সুখী আমি—আমি সমবায়
নিজের কথা কাকে বলি—পর যে আপন হয় ।

স্মৃতি ঃ দাবদাহ

(শ্রীযুত শঙ্কর মিত্র অগ্রজপ্রতিমেষু)

কেমনে লুকাবো মুখ, কোথায় লুকাবে
কোনদিকে দেবে পাড়ি—
চারিদিকে দাবানলে
জ্বলছে যে প্রাণে প্রাণ ঃ হৃদয় লোপাট।

যদি কিছু তাপ থাকে বুকের আগুনে
মমতার—,হয়তো বা
বাঁচার ঃ জ্বলে দাউ দাউ
ভদ্রতার অন্তর্বাসে দাবাগ্নির শিখা।

সে তাপ কখনো যদি চেরাপুঞ্জি মেঘে
বাষ্পে বাষ্পে ধরা যায়—
বৃষ্টিস্নাত প্রিয় রোদে
দাবদাহ স্মৃতি কত হৃদয় রাঙায়।

সুকান্তের পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে/১৯৭৬

পঞ্চাশ বছর ধ'রে রয়েছো দাঁড়িয়ে
নিজের মাটিতে, যেন এক শালপ্রাংশু
শাখা প্রশাখা ছাড়িয়ে কাল জয় ক'রে
দখল করেছো মাটি কঠিন প্রয়াসে।

পঞ্চাশ বছর আগে কণ্ঠে নিয়ে গান
পাখির মতো 'তা' দিয়ে ফোটাতে গোলাপ
পূবের আকাশে গিয়েছিলে—'কমরেড
আমার ভারতবর্ষ গোলাপ হবে কবে।'

তুমি বুঝি নদী, কোনো সময় ডিঙিয়ে
দুকূল ছাপিয়ে জল-তরঙ্গের ঢেউ
তোলো সমগ্র স্বদেশ, বুকের পাথরে
চাপা রক্ত-করবীরা রাঙা হয়ে ওঠে।

চোখের অরণ্যে রৌদ্র

মুগ্ধ চোখ এমন সুদূরে প্রসারিত হবে কোনদিন··· ।
একতাল মেঘ সেদিন আমার পকেটে কিভাবে জমেছিল
যা অভাবনীয়,
মুঠো মুঠো বৃষ্টি সূর্যের বল্লম ছুঁড়ে আমাদের চোখে বিঁধেছিল
যা অচিন্ত্যনীয়,
সে এক অজেয় মূর্তি
শবাসনে শিব, অন্নপূর্ণা বক্ষপটে মৎস্যাসনা—
এমন চিত্রিত ছবি মেঘে মেঘে বৃষ্টি নিয়ে
চোখের অরণ্যে রৌদ্র ।

ঠিক এইভাবে মুগ্ধ চোখ পেতে হলে
চলো যাই মেঘালয়ে—
তাল তাল মেঘ ধ'রে দু'হাতে পকেটে পুরি
বৃষ্টি আলো নিয়ে
কিছুক্ষণ খেলা-খেলা পরম প্রাপ্তির—
তাপদগ্ধ খরা-ক্লান্ত মইমারা এ-জীবনে ।

অনন্য হৃদয়

(ডাঃ নন্দীর কথা মনে রেখে)

সবুজ ঘাসের বুকে বুক রেখে আমি
খুঁজেছি তোমার মন—অনন্য হৃদয়।
সুখ নয়, শান্তি নয়—নয় তৃষা স্বর্ণ
শুধু উজাড়-হৃদয়। ধর্ম তব কর্ম
জীবনের বলিষ্ঠ প্রত্যয়। এ মাটির
বুকে রচেছিলে তুমি স্বকীয় সত্তায়
আশ্চর্য ফসল ; যুগদাহে দগ্ধ নয়
সূর্যতাপে প্রাণবন্ত সবুজ-হৃদয়।

রক্তাক্ত হৃদয় চিরে   এ গ্রামের বুকে
সূর্যমুখী জেগে আছে   তোমার বাগানে
জ্ঞানবৃক্ষে ফুল ফোটে—ফুলের সৌরভে
সুষম বিকাশ দুরন্ত তরুণ প্রাণে।

পৃথিবী কঠোর বড়ো—কৃত্রিমতাময়
সূর্যের ফসল তুমি—অনন্য হৃদয়।

বোধিবৃক্ষ

যে মাটি অহল্যা ছিল কতোকাল, দ্যাখো
আজ সে দূর্বার প্রাণবন্ত, বুঝি স্পর্শ
কার : নয়নাভিরাম কোন বোধিবৃক্ষ—
সবুজে স্বপনে জনকের মাটি উৎকর্ষ ।

এ মাটিতে যে পাদপ প্রকাশে উন্মুখ
আত্মদানে অঙ্গীকার স্থিতধী তন্ময়
সমস্ত তল্লাট জুড়ে তপোক্লিষ্ট মুখ
মৃত্যুকে দুপায়ে দ'লে গড়েছে নিলয় ।

এখানে হয়তো ফুল ফুটবে চমৎকার
তখন থাকবো নাকি আমি বুনো ঘাস
তাতে কিবা আসে যায় বরং কি বাহার
ফুলে ফলে বোধিবৃক্ষ স্থিত বারো মাস

আমার সমস্ত সত্তা তোমাতে অন্বিষ্ট
প্রকাশে ব্যাকুলতর, বোধে শান্ত শিষ্ট ।

কবি দুর্গাদাস সরকারের অকাল প্রয়াণে

তোমাদের মতো কিছু মানুষ আছে বলেই
প্রত্যহ সকালে গোলাপের মতো সূর্য ফোটে
নৈসর্গিক মহীরুহে,
তোমরা আছো বলেই
আকাশ ভরা তারার নীচে বাসযোগ্য স্থান গড়ে ওঠে
কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনাম
মানুষ আছে বলেই
ইতিহাসের নেপথ্যে ভাবীকাল কথা বলে।

দীর্ঘ সাবলীল মানুষটি হেঁটে চলে গেল
লোভহীন, লজ্জাহীন পদক্ষেপে
পিছনে পড়ে থাকে পায়ের শব্দ
খানাখন্দ রাজপথে
খাঁটি কাকে বলে।

তুমি চলে গেছ খাঁটি খুঁজে খুঁজে, বৃক্ষে বৃক্ষে
যে ফুল ফুটেছে, কিংবা
এই মেঠো পথে আমার বুড়িমা
গুমরে গুমরে মরে।
আসলে তুমি যে ছিলে
আসল ময়ূর দাঁড়কাকের ভিড়ে।

মাটির রঙ

মেটে রঙ দিয়ে কে লেপেছে আকাশ, দূর থেকে মনে হয়
ধূ ধূ তেপান্তর—
নাকি এক কানানদী, বর্ষার প্লাবনে মাতোয়ারা
বেনোজল থৈ-থৈ।
সবুজ পাড়ের শাড়ী ভেজা গোড়ালি ছাড়িয়ে
সীমান্তে মিলেছে, তারই মাঝে
লাল এয়োতির চিহ্ন আকাশ সমুদ্র পাড়ি যে মিলেছে দূর
ঠিক যেমন জীবন, তবু তো সবই সত্য মাটি, জল, নদী, বৃষ্টি
গ্রহতারা সবুজ বনানী।

যদিও পৃথিবীর পরিচিত সত্যগুলি মার খায়
মার খাচ্ছে মানুষের বিবেক
কারণ ভিটেতে প্রলোভন বৃক্ষের শিকড় গেড়েছে
আস্তানা গুটিয়ে ঊর্ধ্বে
পরভোজী হন্যে গ্রাস করে রস—জীবনের যাবতীয়
বোধ, ভালোবাসা, স্মৃতি
তাই পারি না কিছুতেই প্রিয় বস্তু ভেবে চুমু খেতে
নেকড়ের মুখে।

অন্য কথা এবং বলা

(আমার পরম আদরের বিপাশা, বিদিশা, মানতু ও ক্ষমাকে)

জানিয়ে নালিশ হারিয়ে গেছে
শিশুর মনে গান

ঋণের দায়ে বিকিয়ে গেছে
মরাই ভরা ধান।

দিন দুপুরে কালোহাতে
কতো ছলাকলা

মিষ্টিমুখে দেঁতো হাসি
যায় না কথা বলা।

বুলবুলিতে খায় না সে-ধান
খায় না ইঁদুরে

আটকে গেছে রথের চাকা
কালোবাজারে।

অন্যমনে অন্য কথা
বলা বড়ো দায়

নিজের ঘরেই তবিল ফাঁকা
কি আছে উপায়

কেউ দেখে না মিলিয়ে হিসেব
নিজেই নিরুপায়

সাগর জলে ঢেউ উঠেছে
রুখবে কেরে আয়।

একটি শিশুর কাছে

(আমার মহুয়ার জন্য)

কার সে গানের কলি বুকে চেপে বসে
দুধের শিশুর মতো,
ছাড়ে না কিছুতে
সুরের আবেশ—
চৈত্রের ক-ফোঁটা বৃষ্টি বুঝি
দগ্ধ দেহলীর প্রান্তে ফুল হোয়ে ফোটে।

রজনীগন্ধার মতো উদ্ভাসিত প্রতীক্ষার কুঁড়িগুলি
উত্তাল বুকের তটে
মেঘ রৌদ্র নিয়ে কতো ঢেউ তোলে,
মনে হয়
নারী নদী নয়
সুরা সুর নয়
অর্থ সব নয়
একটি গানের কাছে
একটি শিশুর কাছে
একটি ফুলের কাছে।

শরৎচন্দ্র

ব্যথিত যে বেদনায় তুমি সে-হৃদয়
মানুষের, কী নিটোল যন্ত্রণা-ফলন
ফুলে ফলে পূর্ণ প্রকৃতির উন্মোচন
ক'জনেই বোঝে যে সে-মর্ম বিনিময়।

কে সে পাপী, কারে বলে পাপ, কিসে রয়
মূল্যবোধ, কত কী যে কালান্তদহন
ধর্মাধর্মে, নাম তার সমাজ শাসন
এই সব বোধ, মনে হয় বোধ নয়।

এ হেন দেশে তুমিই সেই সব্যসাচী—
জীবনের অভিজ্ঞতা বুকের কলমে
যার ফুল হোয়ে ফোটে, হৃদয় রঞ্জন
সাহিত্য প্রাঙ্গণে। সে-মাটির কাছাকাছি
তুমি একা বনস্পতি—স্থাবর-জঙ্গমে,
প্রোথিত সে-মূলে ভালোবাসা অণুক্ষণ।

জীবন কাকে বলে

জীবন যে কাকে বলে, শুধু বেঁচে থাকা
নাকি বাঁচা, গোয়ালে গোয়ালে পাল পাল
পুরে রাখে কালের রাখাল—কে সে, কার জন্যে
প্রভুর যৌবন ধরে রাখা ভক্তি-নামে

কিংবা নাকি পুরুরবা জর্জর নায়ক
পিতাকে অর্পণ কোরে পৌরুষ মহিমা
জ্বলে আত্মদাহে ; কিংবা দেবব্রত প্রাণ
শরে শরে বিদ্ধ যাঁর আপাদমস্তক

কার আশীর্বাদ ! জীবন যে কাকে বলে—
জন্ম দেওয়া-নেওয়া কিংবা টিঁকে থাকা
কার অভিশাপে এবং শিখণ্ডীর মতো,
পিত্তি পড়ে আজন্মই—এইতো স্বদেশ !

হোক না ভীষ্মের জন্ম এই দেশে, মুখ
না লুকিয়ে নপুংসকের কাছে, হারাবে না
নিজেকে যে উর্বশীর রূপের লাভায়,
সুড়ঙ্গের মতো অন্ধকারে থাকা নয়

পার্থ যদি কাছে আসে চাঙ্গা হোয়ে ওঠা
পাশবিক মুখগুলি ভয় পেয়ে যায় ।

কবি ভারতচন্দ্র

মাটিতে মিলিয়ে হাত যে ফসল ফলে
দেহকে পাতন করে নিশ্রুতি রাত্রিরা দিন হয়ে যায়
তাল-লয়-সুর মেলাতে জানলে পাখির মতন মন উড়ে যায়
কয়জন সেই পাখি।

'রোনের' হৃদয় চিরে কাঁটাগুল্মে ফুটেছিলে গণ্ডগ্রামে
শতাব্দীর বুকে ঝড় তুলে
জলাঙ্গীর স্রোতে ভেসে সুড়ঙ্গ কেটেছো রাজার হৃদয়ে
বাঙালীর আদালত লজ্জা পায় কার বেত্রাঘাতে।

সন্তানের দুঃখ কী যে সর্বকালের ঈশ্বরী পাটনী বোঝে
অথচ সুন্দর এলে মালিনীর ভাঙা মালঞ্চে ফুল ফোটে
বাহিরে দাঁড়িয়ে দুঃখ ভেতরে বিবেক যদি জ্বলে,
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বুঝেছিলো—ঃ তুমি তো সুন্দর সৃষ্টির মালঞ্চে।

এমন কজনা আছে হৃদয়কে ছেড়ে জাহ্নবীর কাছে—
হেরাসিম লেবেডফ, রেভারেণ্ড লং, পাদরী ওয়েঙ্গার
জলের সন্ধান পেয়ে অঞ্জলি ভরেছে স্বাদিষ্ঠ সত্তায়
তুমি নাকি সেই কবি—বাঙলার কালিদাস, পোপ ও বার্ণস।

মে-দিনের কবিতা/১৯৭৭

মে-দিনে
একটি দামাল শিশু আইসক্রীমে মত্ত
একটি পাগল কিশোর পলাশ রঙে স্তব্ধ
বাতাস পেলে আগুন যেমন
বাধা পেলে বন্যা মাতন
পৌনে ছ' লক্ষ গ্রাম গর্জে ওঠে আজ
মে-দিনে বুঝি স্বদেশ আমার লাবণ্যে লাল।

স্তরে স্তরে গাছে গাছে কি বিচিত্র কৃষ্ণচূড়া
রৌদ্রে জ্বলে আকাশ তলে লাল-পতাকা
আলোর প্রবেশ নেইকো মানা
থুঁতনি নাড়ে আমার কন্যা
কলার পাতে বনভোজন কী যে ভালো লাগে
মে-দিনে বুঝি আমার স্বদেশ মুখর ঐকতানে।

বাইরে হাজার ভালোবাসা, দুর্নিবার—
গরম লেগে শেকল বেড়ি এমনি খুলে যায়
পড়ছে খসে নরক সমান জেলগুলি
এমনি দিন আসবে বলে দরোজা খুলে রাখি
দেখবো কত প্রিয় মুখ লাখো লাখ
মে-দিনে যেন স্বদেশ আমার ভালোবাসায় কৃষ্ণচূড়া।

সাতাত্তরের মৌসুমী হাওয়া

কতোকাল—
নিষেধ সত্ত্বেও চোখের দু'পাতা হাট কোরে রাখা ;
কখন আসবে তুমি—
মেঘের পাহাড় পার হোয়ে
আছড়ে পড়বে আমাদের ঘর-দোরে, বারান্দা ও বিছানায়
মুখের আদল পড়ে নাকো মনে
অথচ পেয়েছি টের প্রত্যহ অলক্ষ্যে
নিঃশব্দ নিঃশেষে ঃ কার স্পষ্ট পদধ্বনি

কখন যে এসে গেলো শীতের কুয়াশা ফুঁড়ে
সাতাত্তরের মৌসুমী হাওয়া
সূর্যের পাঞ্জার মতো প্রসারিত দৃঢ় হাতে
ছিনিয়ে নিয়ে এলো কাম্য সময়

মোরগের তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জেগে ওঠে ঝর্ণা, পাখি, নদী
সমুদ্র পর্বত ঃ ইতিহাসের পাতায় একটি সকাল
অথচ জানতো না কেউ কাল পর্যন্ত—
এমন ঘটনা ঘটে

কৈশোরের চোখ দুটো যদি ফিরে পাই।

নজরুলকে নিবেদিত
(নজরুল-এর জন্মদিনে)

১
তাকাতে পারি না আমি তোমার দুচোখে : বধ্যভূমি—
ফলে না ফসল কতোদিন
তুমি কী নক্ষত্র হ'য়ে গেছো কিংবা মুক্ত
আকাশ সমুদ্র বরং শুকতারা শুধু জ্বলো নিঃসীম নিঃশেষ
গ্রহলোকে : জীবনকে কদিনই ধরে রাখা যায়
সূর্যের কাঁটায় ; ছেঁড়া কথামালা কেবলই
হু হু করে হৃদয়ের নীচে—আলোর রশ্মিতে
দৃশ্যহীন জীবাণুরা কিলবিলু করে
আমি তাকাতে পারি না,
বৃষ্টি দুচোখের পাতায়।

অথচ কে কবে
হৃদয়কে ছেড়ে স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসন চায়।
সৃষ্টির আদিম যুগে উত্তাল সমুদ্র বক্ষে শয়ান যিনি, কী
অনুপম তাঁর হৃদয় নৌকাটি,
এবং অগ্নিবীণা থৈ থৈ ক'রে যন্ত্রণায়, সৃষ্টিতে আগুন
অবিনাশী নিস্তব্ধ নিঝুম।

২
(নজরুল-এর মৃত্যুদিনে)
এমনিতরো গুমোট দিনে অশ্রুঝরে অঝোর
শ্যামল মেঘে শ্রাবণ ধারা স্মৃতিকে দেয় নিশান
কবে কার সে রক্তবীজের মূলে মেরে এক টান
দামাল ছেলে ঘুমায়, অবাধ মালিকানা ভেঙে।

কে হে তুমি, ধরে রাখো দেশের সীমায় যাঁকে
মৃত্যু তাঁরে আলো দিলো, দখল দিলো দেদার
মাটি জুড়ে স্থায়ী পাট্টা ভাগ্যে আছে কার
মাটির তলায় বন্দী করা যায় না কভু তাঁকে।

এই সব ছবি

এই সব ছবি, ছবি নয়
ছুঁয়েছে আকাশ পৃথিবীর পাড়
ছড়িয়ে রৌদ্রের শিখা : এইমাত্র খুন চেপে ছিলো—
কেননা, রুপোলী মেঘের পর্দা ঠেলে উঁকি-ঝুঁকি মারে
চিরকালের অবাধ্য যুবক, গজমতি হার
দুলিয়ে বেণীর মধ্যে রুপশালী রমণীরা
মাথা নাড়ে···
কাছেই হৃদয়ে হলুদ মেখে শরবিদ্ধ বাবলারা হাই তোলে
মেঠো পথ চলে গেছে ভিনগাঁয়ে পড়শীর কাছে
বিড়ি মুখে কিশোর রাখাল হিন্দি গান ধরে
মাটির পাঁজরা ফুঁড়ে
হাল চালায় কৃষক যুবক, নাকি পাইলট—
শ্রাবণে বসন্ত আসে শিহরণে
মুখপোড়া বেপরোয়া পাখি ঝোপবুঝে কোপ মারে—'বউ কথা কও'।

এ গ্রামের হৃৎপিণ্ড : এক কানা নদী
ঘড়ির কাঁটার মতো টিক্‌ টিক্‌ টিক্‌ চলে, নিরন্তর
পদধ্বনি রেখে যায়, আমার দেখ্‌তো এই তো সেদিন
গোঁড়ালি ঠুকে ঠুকে স্কুল পালানো কুমারী এক মেয়ে,
হেরে হেরে হেরে লড়াকু ছেলেটা মাথা গুঁজে চ'লে গেল·
দূর থেকে ভেসে আসে "চোখ গেল, চোখ গেল"।

খেলা : খেলতে যে পারে

ধরতে যেওনা হে সে খেলছে আপন খুশীতে
তাড়া খেলে ভয় পাবে কিংবা পড়বে নয়তো ছুটবে বেহুঁশ পাগল
খেলতে দাও তাকে কানামাছি খেলা কিন্তু অন্ধ নয়

শব্দ ও ছন্দের হাত খেলাতে জানলে যেমন কবিতা,
শ্রমে ও স্তোত্রে বদলে যায় মানুষের কণ্ঠস্বর
আর ভালোবাসায় চাবুকের মতো কাজ হয়।

সে খেলছে আপন খুশীতে
সে হাসছে শিশুর আনন্দে
সে ঘুরছে নিজের গতিতে
সে কাঁদছে ব্যর্থতায়, পরাজয়ে।

তবু খেলছে লুকোচুরি আলো ও আঁধারে
যেমন মেঘের আড়ালে রৌদ্র অথচ ভেতরে
বিদ্যুৎ ও বজ্র মনের মধ্যে আগুন নিয়ে
খেলা যেন আজীবন এবং আমৃত্যু।

এই খেলা খেলতে যে পারে সেই বুঝি কবি
কিংবা বিপ্লবী, হীরের মতন ধারে কাটে
অন্ধকার, পর্বত প্রমাণ মান্ধাতার বাঁধ।
ধরতে যেও না সে খেলছে আপন খুশীতে।

ওরা কি বুঝবে

ওরা কি ক'রে বুঝবে আমাদের তৃষ্ণা
মাছের মতন জলে বাস করেও, মেটেনি
পিপাসা, পিচ্ছিল পদ্মপাতা
যেহেতু আমরা জন্মসূত্রে জলে ভাসি

ওরা কি দেখবে আমার চোখে আলো
চাঁদের আলোয় যারা ভূত দ্যাখে
চোখ থেকেও দিনকানা
ফুটপাতে জন্মে শিশু কান্নায় উপচে পড়া জননীযন্ত্রণা

ওরা কি বুঝবে আমাদের বেঁচে থাকা
মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আজীবন
জীবনটা নাকি মৃত্যু মৃত্যুই জীবন
ভুল হয়, ভয়ঙ্কর ওলোট পালট।

ওরা কি জানবে আমাদের তৃষ্ণা,
আলো,
বেঁচে থাকা

জননী ও জন্মভূমি কি জিনিষ।
বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ড যেন কুরুক্ষেত্র
দুয়ার আগলে কে, সে শিশু, নীলকণ্ঠ।

অনাত্মীয়ের আত্মীয়তা

(শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী হিরণ্ময় গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশে)

বলতে পারিনি তৎক্ষণাৎ—
"কেন এসেছো হে, আমাকে কি দরকার" ?
উসকো খুসকো চুল, যেন ঝড়ো কাক
কি খবর আনে সাঁজ-সকাল
"দূর হ দূর হ ধেত্তোরি ছাই মর গা"
বলেও এমন কথা বলতে পারি না।

বললেন তিনি হেসে, ঘাড়টি নাড়িয়ে টুলে বসে
"শক্তি, চা খাওয়াও হে"
কাজ শেষ, কেল্লা ফতে
জীবনের সারাংশ সার : 'শুধু একটু চা'।
বলিনি কিছুই চেয়েছি মুখের দিকে—
কাছে পেয়েও বাড়াইনি হাত।

কোলকাতা শহরের রাজপথে কুরুক্ষেত্র
ঘটে, ভাবিনি কখনো—অথচ ঘটনা,
এই তো সেদিন ঘটে গেছে খণ্ডযুদ্ধ
সপ্তরথীর চক্রব্যূহে নিহত বিস্ময়—
অভিমন্যু বধ, রক্তের দর্পণে মুখ
রেখে, বলেছিলো—"স্বদেশ আমার"।

বলতে পারিনি তৎক্ষণাৎ
"কেন এসেছো হে, আছে কি এমন কথা ?"
বাজে আজো ঝনাৎ ঝনাৎ—
সেই অনাত্মীয়ের আত্মীয়তা।

জলছবি : শিশু

বৃষ্টিতে সূর্যের মুখ দেখতে পাই না
বটের মাথায় শিরা টনটন করে
ভুবন মাতায় শিশু স্যাঁতসেতে ঘরে
ন্যাড়া ছাদে বৃষ্টি ঢলে নেই কারো মানা
বৃষ্টি
শব্দ
শিশু
স্মৃতি
সমস্ত চেতনা

নিঃশব্দ নিথর বুকে হাহাকার করে
শশব্যস্ত মেঘদূত মাথা খুঁড়ে মরে
যক্ষের বিরহ দীপ নেভাতে পারি না।

অথচ তোমাকে ফেরাতে পারি না, বৃষ্টি
করতলে ধরে রাখি দুহাত বাড়িয়ে
শিশুদের মতো, গলে পড়ে তা-তা সুখ
নাগকেশরের বনে চন্দ্রহার, সৃষ্টি
সমুদ্রের চেয়েও উত্তাল, উপচিয়ে
জলছবি, শিশু : বৃষ্টিতে সূর্যের মুখ।

আচার্য সুনীতিকুমার

শিমুলে শালুকে যে বিচিত্ররূপ দেশে
আসলে বাহার সব বাহাদুরী তার
সঙ্গে ফোটে। পণ্ডিতের কচকচি সার
বৃথা তর্ক যাঁকে মানায় না, রসে-বশে
প্রকৃতির অগ্রদূত ঋতু সমাবেশে,
বেল যুঁই চামেলীর আত্মত্যাগ,—মণিহার
রত্ন, পরম আচার্য সুনীতিকুমার
দেখলে মন কি খুশী দেশ বা বিদেশে।

প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষিত বীজ যে-মাটিতে
নিগূঢ় উর্বর, অংকুরে বিস্ময় যিনি
কবীন্দ্র রবীন্দ্র ধন্য ; কণ্ঠে নিরবধি
লোকায়ত শব্দ যাঁর, নিষ্ঠা আচম্বিতে
গজায়নি, বরং আজন্ম ভাষার সন্ধানী,
সুখে-দুঃখে বেদনায় পৌরুষে স্থিতধী।

এখানে একক আমি

লোভের মোহানা থেকে
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা স্রোতের জলের বেগে আপন আপন
শিল্পীর তুলির টানে চিহ্ন তার স্পষ্ট—
চোখের কাজল চোখ ছাড়া যেমন
দেখা যায় না আলাদা—
এখানে একক আমি।

স্বর্ণমারীচের পিছে পিছে ধাওয়া মানুষের
সে তো ঘটে আজো
মুহূর্তের ভুল বলে বেলুনের মতো ফুঁ দিয়ে ওড়ানো
ঠোঁটের ব্যাপার, তাই
অধুনা রাবণ সোনার বলয় নিয়ে লোফালুফি
করে মনের নন্দিতা,
মোহিনীডলারে হরিলুঠ শহর ছাড়িয়ে গ্রামে
সেখানে একক আমি।

তোমার কালো হাতের বাহুল্য
ক্ষমাহীন, নিন্দনীয়—, গুটিয়ে নেওয়া শামুকের মতো
আছে সে এক রাজত্ব
সেখানে আমার ব্যাপ্তি, ভুবনবিজয়ী আলো!

কিছু মুখ আছে

কিছু মুখ আছে
মনে পড়লেই ভেসে ওঠে
জলের দর্পণে একুশ বসন্ত যেন,
বিস্মিত দুচোখে সময় প্রতিমা
ছাড়পত্র চোখের পাতায়
কতোদিন ঘুম নেই চোখে
রাণার আসবে নিয়ে কাম্য সময়
কিংবা কোনো পূর্বাভাস নিদারুণ দিনে।

কিছু মুখ আছে
দেখলেই ঝড় বয়ে যায় দেহের শিরায়
আমাদের চারিপাশে রক্তশূন্য বৃক্ষের শরীর থেকে
ঝরে পড়ে ঝরোকা পাতার হলুদ ঝালর
শতাব্দীর শবদেহ থেকে
রাত্রি, অন্ধকার—
কাল-রাত্রি শেষে
মমতার মুখ ঃ চিঠির ঠিকানা।

কিছু মুখ আছে
দেখলেই রক্তের স্পন্দন, শির শির ক'রে ওঠা
বৃক্ষের দ্যোতনা
অথবা সে মুখ
একটি নদীর মতো মিশে যেতে চায় তিরতির
কোনো এক মোহানায়
আবেগে, উত্তাপে একাকার
নিশ্ছিদ্র পাথারে চোখের দুটি মণি স্থির।

কিছু মুখ আছে
সে মুখে খোদিত তিতিক্ষার গ্র্যানাইট

অথচ তারই বুকে হাসছে পাদপ
ছড়িয়ে হাসনুহানা
এবং দুমড়োনো রোদ,
নিজেকে ডুবিয়ে অকাল বসন্ত আসে
পাখিরা চঞ্চল, প্রতীক্ষায়
উদ্ভিন্ন অংকুর।

কিছু মুখ আছে
চিকচিকে জলে খেলা করা নিজেকে হারিয়ে
কাঞ্চন জ্যোৎস্নায়
তোলপাড় করে এ-পৃথিবী জলের গভীরে
নিঃশেষে বিলিয়ে আন্দোলনে
শুধু জ্বলে তুষের আগুন
একটি বৃক্ষের মতো স্বকীয় সত্তায়

জলের দর্পণে যতবার মুখ দেখি…

হাতে হাত দাও

হাতে হাত দাও, সব ভয় কেটে যাবে

ধুঁকতে ধুঁকতে মৃত্যুপথযাত্রী অক্সিজেনের সিলিণ্ডার
ছুঁড়ে ফেলে
হাত বাড়িয়ে দেয়
কেউ যদি ধরে হাত
ঝাপসা দু'চোখের
মেঘ কেটে যায়
ঠোঁটে মৃদু হাসি
ঝিলিক বুঝিবা,
কিছুক্ষণ যুঝে ওঠে।

হাতে হাত দাও, সব ভয় কেটে যাবে

লড়তে লড়তে মরিয়া ছেলেটা মরতে পারে না
মৃত্যুকে মুঠোয় রেখে হাত এগিয়ে দেয়,
কেউ যদি ধরে হাত.........
করতালি দেয় ঝড়ে
পাথরে নুড়িতে, শুকনো পাতায়, ফুলে আনত ভূমিতে শুয়ে
উদোম ছেলেটা,.........
লড়াকু ছেলেটা লড়ে যায়।

হাতে হাত দাও, সব ভয় কেটে যাবে

ধুঁকতে ধুঁকতে, লড়তে লড়তে—বরাভয়
মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন ট্রয় বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ
নাহলে নিজেকে যায় না কখনো চেনা
যেমন একদা পার্থ,
চিনেছিলো নিজেকে দর্শনে, বিশ্ব—
হাতে হাত সারথীর।

পাথর প্রতিমা

আজন্ম নত আমি, আমি আমাকে ভুলে ঝুমকোলতারই মতো
দিয়েছি বিলিয়ে বিলকুল ইহকাল পরকাল, যদি পাই পরশ পাথর
বজ্রাহত পোড়া মাঠ বুঝি রক্তিম লজ্জায় কে রাঙায়ে দিয়েছে
চৌচির গাল, পাথর প্রতিমা, অলক্ষ্যে মজা নদী একা একা বহে যায়—

অশোক অলকানন্দা নেমেছে এখানে মহাকাশ ফুঁড়ে নীচে
পৃথিবীর বুকের ওপর, আমি তো আমারই নয়, আমার মাথায় রাখো হাত
আমি তো স্বপ্নে, বিস্ময়ে বিচ্ছিন্ন কখনো নই যেমন ঢেউ ছাড়া জল
কিংবা হাওয়া ছাড়া গাছ, গলা ছাড়া রেওয়াজ অথবা ঝর্ণা ছাড়া পর্বত—
প্রতিবেশী বন্ধু ছাড়া স্বকীয় সত্তার নেই উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলংকার,
আজন্ম প্রণত আমি কোনও বেড়ার ধারে ঝুমকোলতারই মতো

আমি আমারই নয়, ঘোরে আমাদের মন
যেমন পৃথিবী, চাঁদ
হাতের কাছেই ঘোরে,
না-আঁকড়া ছেলেটি যেমন ঘোরে মায়ের আঁচল ধ'রে।

আলোকাভিসারী

বৃক্ষের পাতার 'পরে চোখ রেখে অনেক সময় ভুলে যাই
আমি যুগের নফর
চারিদিকে পিছুটান—সংসার, সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস—
আকাশের নীল আলো চোখের পাতায় ফেলে
আমি আলোকাভিসারী

নদীর তাতালো বালি খুঁড়ে খুঁড়ে ভুলে যাই
আমি নগণ্য মজুর
পিছুটান গর্তের গভীরে,
একটা দামাল শিশু শুধুই হাসছে
সব কিছু জয় ক'রে অমৃতের স্বাদ আকণ্ঠ অবধি
আমি অমৃত পিয়াসী

কোথা কিছু আছে, কিছু থাকে, এই সাত পাঁচ ভেবে ভেবে
আমি উপাসক মানুষের
দিনকে রাত, রাতকে দিন করি নিঃশেষে পুড়িয়ে
নিজেকে ধূপের মতো—পাণিপ্রার্থী
শুভ আগামীদিনের।

মলমাস

কি নিবিড় অনুভবে উথলে উঠছে চরাচর—

কার টানে রাত   দিন হয়
কার স্পর্শে বেল যুঁই চামেলী চাঁপার সমাগম
কার অশরীরী ঠোঁট আমার চিবুকে বসে দোল খায়
জীবনে বোধনে অনির্দেশ্য আত্মীয়তা...... ।

কিন্তু অনিবার্য.........

তবু ঝোঁক চৈতন্যে বিশেষ, কখনো বা
মধুমাস ঃ   আত্মীয়তা পাহাড়ে-পর্বতে
সাগরে-নদীতে, কৃষ্ণ ও রাধাচূড়ায়
কিংবা সাত পাকে বাঁধা সমাজ-বিজ্ঞান

তবু তো অনস্বীকার্য.........

আমার মন তো ভালো নেই

দিগন্তে দিগন্তে নতুন শিশু জন্ম নেবে
সূর্যের ঔরসে, এমন মানবী নেই.........
এমন প্রেয়সী নেই বুকের উনুনে গনগনে আঁচে
নিজেই উত্‌লে ওঠা দুধের মতন
আবেগে আছড়ে পড়ে অতৃপ্ত মেঝেতে
অথবা দুরন্ত ঝড়ে
নিজেকে বিছিয়ে দেয় শেফালির মতো আনম্র মাটিতে
দুঃখের ছোবলগুলি বিষে, বিষক্ষয় ।

আসলে চেতনা, মধুমাস কিংবা মলমাস চেনা যায়
হাওয়া যখন বয় ।

বক্সা দুয়ার খুললো না

যে কথা বলার ছিলো—
পৃথিবীকে ভালোবাসা কারো একচেটে অধিকার নয়
কিংবা প্রাপ্তির সম্মোহন শর
ঘুমবিদ্ধ চাঁদ—, সুখের প্রতিমা
নেপথ্যচারিতা নিঃসঙ্গ নদীর কোলে শুয়ে থাকা একা,
কখন ফুটবে ফুল সন্ধ্যামণি ফুরফুরে হাওয়ায়
দরাজ হৃদয় ঢেলে দীর্ঘ বটগাছ
খাল-পাড় খুঁড়ে তীরন্দাজ মাছরাঙা
নাচতে নাচতে পালিত ময়ূর পেখম মেলবে কিশোরীর বুকের আঁচলে
চোখের মণির মতো রাজহাঁস ঢেউ খাবে শুকনো আড়ায়।

আমার বলার ছিলো
বাজী রেখে বুক ঠুকে—
পৃথিবীকে ভোগ করা মানে কারো স্বাধীকার কেড়ে নেওয়া নয়।
অথচ ফুলিয়ে ছাতি ভরাট বুকের—
অনির্বাণ বলেছিল—"মাগো, স্বদেশ আমার, মায়ের চেয়েও সেরা"
মা তো কোনো কথা বলেন নি—
কথাগুলি ঠিক কি বেঠিক পুনর্বিবেচনা চাই।
কারণ মা মারা গেছেন পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে—
পুজোয় নরুণ পেড়ে শাড়ী কেনা হয়নি
ভাইটা পাগল হয়ে গেছে ঃ ঘরছাড়া কতোদিন
বোনটা চোখের জলে নোনাস্বাদে ঘর বেঁধেছে একা,
তিরিশ বছর গেল—
বক্সা দুয়ার থেকে অনির্বাণ আজো ফিরলো না।

সাইরেন

মাত্র কিছুক্ষণ আগে আমার হৃৎপিণ্ডটুকু নিয়ে
শয়তান রাবণেরা লোফালুফি ক'রছিল বলের মতন
শূন্যে, গোলোক ধাঁধায়
আমি সত্যি নিরুপায়
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো জ্বলছিল গণগণ—
শিরা, উপশিরা, ধমনীরা রক্তস্রোত উপচিয়ে।

সূক্ষ্ম যন্ত্র ও যন্ত্রীরা বাজাচ্ছিল সাইরেন একটানা
একঘেয়ে, সময় তলিয়ে যায় নিঃসাড়ে
ব্রহ্মতালু অগ্নিগর্ভ
নরক, হারিয়ে স্বর্গ
মান-কচু পাতায় মণি দুটি গলে পড়ে চুপিসাড়ে—
কেউ দেখলো না, জানলো না ;   কী হারালো তালকানা।

ঠিক এইভাবে আমার কৈশোরের কাঁচা মাথা
পেয়ারার মতো খেয়েছিলো নিরামিষ ভোজী, রাজনীতিবিদ
ঠকাতে ঠকাতে, ঠকে নিজবাসে
পরবাসী, ঝি ঝি ডাকে গলা সাধে—
ট্যাঁকেছিলো দেশলাই, জেবলে দিতে বাঁশবনে জোনাকির মিথু
হাতের তালুর মধ্যে ছিল যাদু, প্যাঁচের অভিধা।

ফুল ও রঙকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা প্রাত্যহিক দুর্ঘটনা
কোন মাথা কার ধড়ে, কোথা খেলে হৃদয় দারুণ
কোন ফুল কোথা ধরে, হৃৎপদ্ম ছিন্ন
ক'রে স্বাধীন স্বদেশের মুখ খুঁজি তন্ন তন্ন—
কাৎরাতে কাৎরাতে দিবারাত্রি বিমর্ষ করুণ,
সূক্ষ্ম যন্ত্র ও যন্ত্রীরা বাজাচ্ছিল সাইরেন একটানা।

লোকালয়

আদিম তৃষ্ণার রোদ
শুধু নেয় যাবতীয় মূল্যবান বস্তু
যেমন সবুজ পাহাড়ের অরণ্যের, শ্রাবণ-ভাদ্রের মাঠে
অথচ অন্তরে পাহাড়ের শীতলতা, অরণ্যের হাওয়া
শ্রাবণ-ভাদ্রের মাঠ খুঁজি,

নির্জনতা, কোনো বিশেষ মুহূর্তে আমাদের বন্ধু।
নাকি নির্জনতা ঈশ্বরের সম্মোহন তীর

না, ফিরিয়ে নিতে পারি মানুষের মুখ
লোকালয় সামনে-পিছনে,
যত দূরেই যাই, তত দূরেই ফিরে আসি
মরে না, সত্যটা সত্য।

সংগোপনে দেবতার মুখ, নির্জনতা
ভয়ঙ্কর, মানবীয় বস্তুগুলি স্বেচ্ছাচারে আত্মঘাতী,
লোকালয়ে মানুষের মুখ, প্রাণের দোসর!
মুখে মুখ রেখে, চোখে চোখ রেখে, হাত ধরে কথা বলি,

নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা, কেটে যায়
পথ চলতে ভীষণ ভালো লাগে

না, ফিরিয়ে দিতে পারি মানুষের মুখ
লোকালয়।